بِسْـــــمِ اللهِالرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু
আসন-২০৫
জাতীয় সংসদ সদস্য
নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার)

বাণী

১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবসকে বাঙালি জাতির অনন্য গৌরবের দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ তেইশ বছর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাস মরণপণ যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ৪৮তম বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে আড়াইহাজারবাসীসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিজয়ের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ মা-বোনকে, যাঁদের অসামান্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তুলে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়।

দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশকে আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিচক্ষণ ও দক্ষ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এখনও দেশি-বিদেশি চক্র স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও উন্নয়নকে নস্যাৎ করতে উদ্ধত। এর বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মকে রুখে দাঁড়াতে এবং একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কাজ করে যাচ্ছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো, মহান বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু)

সম্পাদকের কথা

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সেই কবে লিখেছিলেন-'সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়; জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়।' কবিতার এই বাণী ১৯৭১ সালেই আমরা বাস্তবে পরিণত করেছিলাম। আজকের দিনে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম প্রধান পেশাদার পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের দামাল তরুণদের কাছে হার মেনেছিল। বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিস্মিত চোখের সামনে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। কেবল স্বাধীনতা নয়; পরবর্তী প্রায় পাঁচ দশক ধরে বাংলাদেশ একের পর এক আরও বিস্ময় সৃষ্টি করে চলছে। আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থানকারী একটি পরাশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সদ্য ভূমিষ্ঠ বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে অন্যায্য আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণী মাথায়-আগায় মিথ্যা প্রমাণ করে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সামনে সার্বভৌম, স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধির সমুজ্জ্বল উদাহরণ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উত্তরণ ঘটেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা বহুমুখী সেতুর মতো মেগা প্রকল্পও প্রমত্ত পদ্মার বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সক্ষমতার জয়গান গাইছে। পদ্মা সেতু মনে করিয়ে দেয় যে, স্বাধীনতা আমাদের স্বপ্ন ছিল নিঃসন্দেহে, একই সঙ্গে প্রত্যয় ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। আত্মবিশ্বাসী এই বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আমরা এবার পালন করছি মহান বিজয়ের ৪৮তম বার্ষিকী।

এবারের মহান বিজয় দিবসে 'আলোর পথযাত্রী' পরিবারের আনন্দটা অন্যান্য যেকোন সময়ের চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। কারণ সম্প্রতি "আলোর পথযাত্রী পাঠাগার" নিবন্ধিত হয়েছে। পাঠাগারটি নিবন্ধিত হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মাননীয় সাংসদের দিক নির্দেশনায় আলোর পথযাত্রী পাঠাগার কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য সাময়িকী "আলোর পথযাত্রী" আজ সবার মাঝে স্থান করে নিয়েছে। এজন্য আল্লাহর দরবারে লাখ কোটি শোকরিয়া।

মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে এবারের **'আলোর পথযাত্রী'** সম্পাদনায় বিষয়বৈচিত্র্য লেখক নির্বাচনে সতর্ক থাকি; চেষ্টা থাকে গুরুত্বপূর্ণ সকল লেখকদের সমবেত অংশগ্রহণে যেন আয়োজনটি একটি মানসম্মত অবয়ব পায়। আমারা কৃতজ্ঞ– দেশের সাহিত্য জগতের কয়েকজন প্রিয় লেখকদের এবারের বিজয় দিবস সংখ্যায় লিখেছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের মর্মবোধও কম নয়। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান ঘোচাতে না পায় অনেক প্রিয় লেখকদের লেখা এবারের সংখ্যায় ছাপাতে সক্ষম হইনি। আমরা তাদের সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোর পথযাত্রী পরিবারের পক্ষে সবাইকে জানাই রক্তিম শুভেচ্ছা।

সফুরউদ্দিন প্রভাত
ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
ডিসেম্বর-২০১৯

রেজিঃ নং: বেগ্র/গ-০০১৪৮নাগ

.....

প্রধান উপদেষ্টা
আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এম পি

.....

সম্পাদক
সফুরউদ্দিন প্রভাত

সহযোগি সম্পাদক
মোশাররফ মাতুব্বর
মহিতুল ইসলাম হিরু
মোয়াজ্জেম বিন আউয়াল
অরণ্য সৌরভ
সামসুজ্জামান লিমন

প্রচ্ছদ ছবি
চিত্রকর মনিরুজ্জামান মানিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ছোট বিনাইরচর, (ফকিরবাড়ি), আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ-১৪৫০।
মোবাইল : ০১৭১৩-৫০৪৪৪১
msprovat@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্য : আশি টাকা মাত্র

আলোর পথযাত্রী পাঠাগার কর্তৃক জননী প্রিন্টার্স, ১০৫ আরামবাগ, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

৭-১৪	স্বাধীনতার অর্জন ও কিছু কথা
১৫-১৬	সাত লক্ষ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আপনার জন্যেই
১৭-১৮	বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র
১৯-২০	কাব্যের জমিনে শেখ মুজিব
২২-২৬	কবিতাবলি

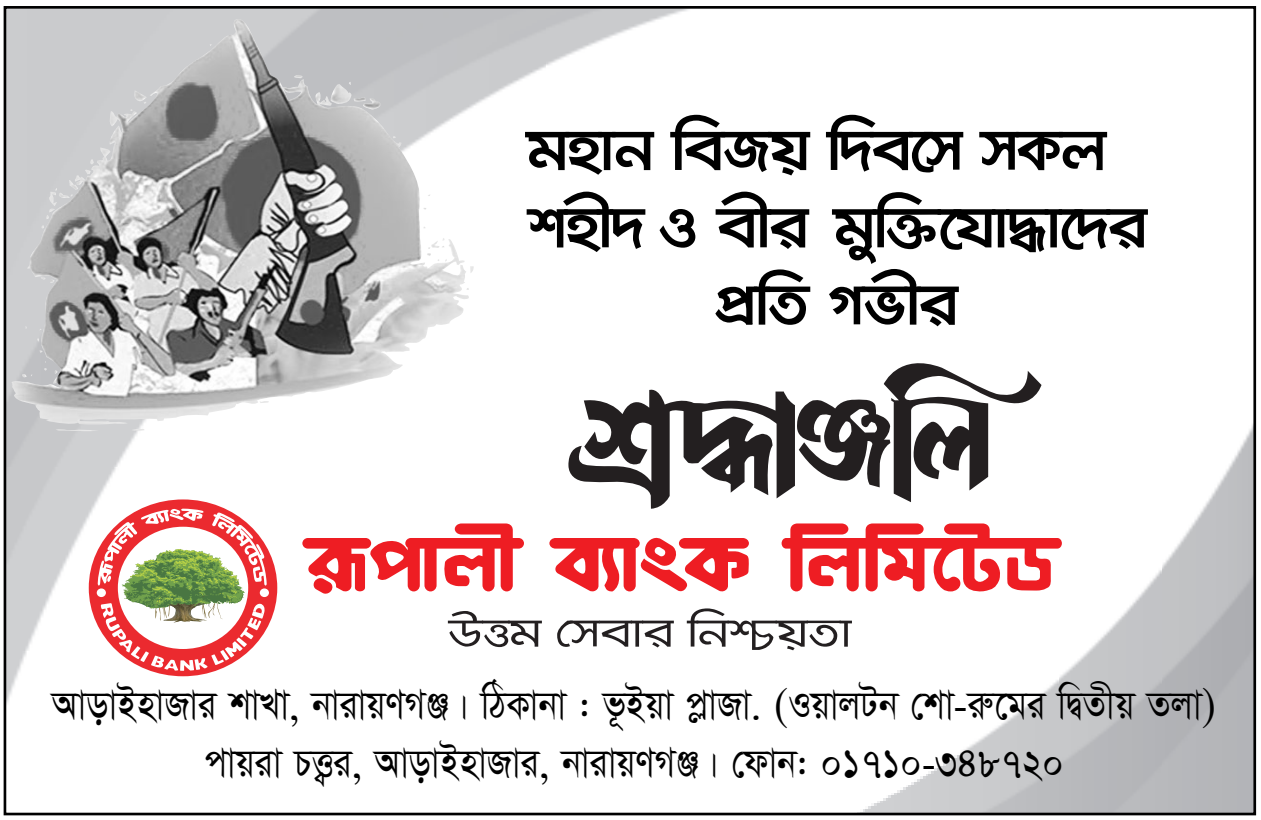

সেবাই পুলিশের ধর্ম
বাংলাদেশ পুলিশ

মাদক একটি পরিবারকে ধ্বংস করে
আসুন মাদক পরিহার করি।
সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ একটি জাতিকে ধ্বংস করে
আসুন ওদের রুখে দেই।
ওদের নির্মূল করতে পুলিশকে সহায়তা করুন।

নজরুল ইসলাম
অফিসার্স ইনচার্জ
আড়াইহাজার থানা, নারায়ণগঞ্জ
ফোন: ০৮৮-০২৭৬৫৪১১১
মোবাইল: ০১৭১৩৩৭৩৩৪৯

আলোর পথযাত্রী পাঠাগারটি
নিবন্ধিত করায় জননেতা
আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু
এমপি মহোদয়কে প্রাণঢালা
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মোঃ বশির উল্লাহ
কাউন্সিলর, ৬নং ওয়ার্ড
আড়াইহাজার পৌরসভা
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

স্বাধীনতার অর্জন ও কিছু কথা

❑ বাছেত খান ❑

প্রসঙ্গ কথা-

এটা সেই ছোট বেলার কথা, যখন কিছুটা বলতে ও বুঝতে শিখেছি। তখন বড়দের কাছে বা মুরুব্বী শ্রেণির লোকদের কাছে একটা কথা প্রায়ই শুনতাম। তা হলো, যায় দিন ভালো যায় আসে দিন খারাপ। এই কথাটা যখন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বলা হতো, তার মানে এই ক্ষেত্রে শিক্ষিত শ্রেণির তথাকথিত বিজ্ঞ এমন কি অতি সাধারণ স্তরের লোকদের মুখেও শোনা যেত, বৃটিশ আমল কতো ভালো ছিল, শান্তি ছিল, আইনের শাসন ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। হাল আমলে এই আমরা যারা বঙ্গবন্ধুর আহবানে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করে পাকিস্তানী শাসন-শোষণ ও বৈষম্যনীতির শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করেছি তারাও স্বাধীনতার পক্ষের বিশাল জনগোষ্ঠির অনেকেই সেই পুরনো বুলিই শুনছি। সেটা হলো পাকিস্তান আমলে আমরা বাংলাদেশের চেয়ে ভালো ছিলাম। পঁচাত্তর পরবর্তী চাকুরিকালীন সময়ে মাঝে মাঝে বিসিএস ক্যাডারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মুখেও শোনা গেছে, পাকিস্তান ভাঙা ঠিক হয়নি। পঁচাত্তরের দুঃখজনক পটপরিবর্তনের পরের একটা সময় পর্যন্ত এদেশের একশ্রেণির মানুষের কাছে পাকিস্তান খুব প্রিয় হয়ে ওঠে।

আমাদের স্মৃতি এখনও এতটা ধোঁয়াটে হয়নি যে আমরা ভুলে যাব, ঢাকার মাঠে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান হকি টিমের খেলায় কী নিদারুণ লজ্জাজনকভাবে স্টেডিয়ামে বসে কিছু বাঙালি সন্তান নিজের দেশের খেলোয়ারদের সমর্থন না করে পাকিস্তানীদের সমর্থন করেছে। কিছু তথাকথিত উঁচুশ্রেণির যুবতী নারীগণ মাঠে পাকিস্তানীদের সাথে জড়াজড়ি করেছে। তাঁদের হোটেল লবিতে গিয়ে ভিড় করেছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দেশের শাসন ক্ষমতায় আসার পূর্বে যারা ঢাকা সেনানিবাসে বেসামরিক কোনো অফিসে বা পদে চাকুরি করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতায় থাকার কথা, আমাদের একশ্রেণির কর্মকর্তার পাকিস্তান প্রীতির নমুনা। সে সময়টায় সিভিল ও প্রতিরক্ষা প্রশাসন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেছে পাকিস্তান প্রত্যাগত ও এদেশের পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন কর্মকর্তাদের গ্রুপ। সে সময়টায় আমাদের স্বাধীনতা ভুল ছিল, মুক্তিযুদ্ধ অন্যায় ছিল, পাকিস্তানের সময়টা ছিল স্বর্ণযুগ ইত্যাদি কুপ্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণ, নতুন প্রজন্মের ছাত্র ও যুবকের মাঝে একটা বিভ্রান্তি প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

বলে রাখা ভালো পঁচাত্তরের আগস্টপূর্ব সময়ে যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতাত্তোর পূনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ছিল, যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকার একটা বিধ্বস্ত দেশ, ভাঙাচোরা অবকাঠামো, ভঙ্গুর অর্থনীতিকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়ায় ছিলেন সে সময়ের সাথে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব মেলানোটা ছিল পক্ষপাতদুষ্ট এবং বাস্তবতার পরিপন্থী। আজ প্রতিষ্ঠার আটচল্লিশ বছর পর বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা কী, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিত্র, বৈশ্বিক অবস্থানে নানা নির্দেশকের বিবেচনায় আমাদের অবস্থান কী এর সাথে আমাদের ছেড়ে আসা বর্তমান পাকিস্তানের অবস্থান কী, বিচার বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে স্বাধীনতার সুফল বা কুফল কতটা। আমরা বিদ্যমান কিছু তথ্য, উপাত্ত দিয়ে বাংলাদেশের অর্জনের বিষয়গুলো দেখতে পারি। তা হলে জানা যাবে স্বাধীনতার ফলাফল আমাদের জন্য কতটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক। অর্থাৎ আমরা যে স্বাধীনতার সুফল বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কথা প্রায়ই বলে থাকি তা কতটা বাস্তব, তা স্পষ্ট হবে।

আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের গর্বিত স্বাধীন জাতি

ইতিহাসের পাঠ পরিক্রমায় একটা বিষয় নির্মম হলেও সত্য, এই কারণে যে, গাঙেয় বদ্বীপ অঞ্চলের বসবাসকারি বাঙালি জাতিগোষ্ঠি যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্তৃত্বের অধীনে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকেছে। তাঁরা একটি স্বাধীন জাতিগোষ্ঠি হিসেবে নিজেদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জীবনাচার ইত্যাদির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। বিশ্ব মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা ও বিকাশের ইতিহাসে বাঙালির অনেক অর্জন ও কীর্তিগাঁথা একটি স্বাধীন জাতির সাফল্য ও বিজয় হিসেবে তেমনভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি যতটা তার প্রাপ্য ছিল। প্রথমে দেশীয় রাজা বা জমিদার, মোগল শাসন এবং দীর্ঘ ব্রীটিশ শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে এক সময় ভারত উপ-মহাদেশীয় অংশীদার হিসেবে পাকিস্তান নামক দেশের আবরণে স্বাধীনতা লাভ করে। আর সেই প্রাপ্তি ছিল মুসলিম জাতি হিসেবে, বাঙালি জাতি হিসেবে নয়। পাকিস্তান নামক দেশটির শাসকচক্রের বৈষম্যমূলক শাসন ও শোষণ আর বঞ্চনার কশাঘাতে এক পর্যায়ে বাঙালি নামটিই ইতিহাস থেকে মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারী বাঙালি ছাত্র, জনতা ও রাজনৈতিক শক্তি বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছে বাঙালি বলে একটি জাতি আছে। এ জাতি আর অন্যের অধীনে থেকে, অন্যের দখলে থেকে বাঁচতে চায় না। তাই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সংগ্রাম, আন্দোলন, জেল ও জুলুম, সম্পদহানি আর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রথমবারের মতো বিশ্ব মানচিত্রে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাই আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের দীর্ঘ ও রক্তাক্ত পথযাত্রা বিফল হয়নি। আজ আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের চিন্তা, চেতনা ও ভাবনা অনুযায়ী চলতে পারি। নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারি। বিশ্ব দরবারে সারাবিশ্বের নানা বিষয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের হয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারি। নিজেদের সম্পদ তৈরি, ভোগ ও বিপনন করতে পারি নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছামতো। তাই এটা নির্দ্বিধায় এবং উচ্চকণ্ঠে বলা যায় আমাদের স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান সুফল হলো বিশ্বে বাঙালি এক মর্যাদাশীল স্বাধীন জাতি। বিশ্বের যেখানেই যাই না কেন আমাকে বা একজন বাঙালিকে আর পরিচয় সঙ্কটে লজ্জায় পড়তে হয় না। নানা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জনের মাধ্যমে সারাবিশ্বে বাঙালি জাতি আজ অনেক মর্যদা, গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার সাথে বিবেচিত হয়। এই সুফল অনেক বেশী স্পষ্ট ও বাস্তব। আমরা একটা বোধে উজ্জীবিত ছিলাম, আর তা হলো, 'স্বধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়।'

জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রত্যেক মানব সন্তানের তথা মানবগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা। যে রাষ্ট্র, সরকার বা সমাজ জনগণের এই পাঁচ মৌলিক চাহিদার যথাযথ সরবরাহ করতে পারে তাকে আমরা একটি সফল রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে পারি। আমরা একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা পূর্বসময় এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের অবস্থানগত তুলনামূলক চিত্রটা যদি পর্যালোচনা করি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বাধীনতার সুফল কতটুকু তা অনুধাবন করতে পারব।

ব্রিটিশ শাসন ও পাকিস্তান শাসনামলের বেশিরভাগ সময় এই ভুখন্ডের জনগণকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অনিরাময়যোগ্য নানা রোগযন্ত্রণা, গৃহহীন, বস্ত্রহীন অবস্থা নিয়ে জীবন যাপন করতে হয়েছে। স্বাধীনতার পরপর যখন আমরা একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি যা যে কোনো যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্যই প্রযোজ্য, আমাদের দেশকে আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রী কিসিঞ্জার তলাবিহীন ঝুড়ি বলে বিদ্রুপ করতো। চারদিকে একটা বিশৃঙ্খল ও কিছুটা অরাজকতা বিরাজ করছিল। কিন্তু অতি অল্প সময়েই সে অবস্থা থেকে আমাদের সফল উত্তরণ ঘটেছে। আজ বিশ্বসমাজ অত্যন্ত ইতিবাচক প্রশংসার দৃষ্টিতে আমাদের দেশ ও জাতিকে মূল্যায়ন করে।

ফলপ্রসু আর্থিক উন্নতি-দারিদ্র্য থেকে মুক্তি

পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এবং পরে আমাদের দেশের দারিদ্র্য সীমা ছিল প্রায় অর্ধেক। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই ছিল হতদরিদ্র। তখন হতদরিদ্রের হার ছিল ৪৮% আর দারিদ্রসীমার নিচে বাস করত ৮২ শতাংশ মানুষ। ২০১০ সালে হতদরিদ্রের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি । এটা সম্ভব হয়েছে ৯০ এর দশকের পর থেকে নানামুখি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা সফল বাস্তায়নের ফলে। একটি স্বাধীন দেশের সরকারের তার

জনগণের কল্যাণের জন্য যে বাস্তবমুখি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষমতা ও তা বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা ও সদিচ্ছা থাকে তা ছিল বলেই এ সুফল অর্জিত হয়েছে। এখন দেশে হতদরিদ্রের সংখ্যা এক অঙ্কের ঘরে নেমে এসেছে যা বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৮ সালে ৭.১%। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য সীমা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে হতদরিদ্রসীমা শূন্যের ঘরে চলে আসবে, সে ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ হবে প্রথম দেশ।
দেশের আর্থিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়নের ফলেই এই দারিদ্র্য মুক্তি সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে। কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যায় যা শুধু ভারত ও পাকিস্তান নয় এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে ইতিবাচক চিত্র। যেমন জিডিপি উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে ৭% বা এরচেয়ে বেশী। মুদ্রাস্ফীতির হার প্রশংসনীয়ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এক অঙ্কের ঘরে। ২০১৮ সালে তা ছিল ৫.৫% যা ১৯৯০ পর্যন্ত ছিল ১০% থেকে ১৫%। মাথাপিছু আয় ২০১৯ সালে ২০০০ ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০০৮-৯ সালে ছিল ৬৭৬ ডলার আর স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ছিল ৩০০ থেকে ৪০০ ডলারের ভিতর। একটি স্বাধীন দেশের অবস্থানে ছিল বলেই এক কোটির ওপর জনশক্তি বিদেশে কর্মরত আছে এবং বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স দেশে আসছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে এবং অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। দেশটি পাকিস্তান থাকলে আমরা কি এত জনশক্তি রপ্তানি করার সুযোগ পেতাম? দারিদ্র্য থেকে মুক্তির একটা দৃশ্যমান ছবি আমরা দেখতে পাব অন্য মৌলিক চাহিদাগুলোর বর্তমান অবস্থা দেখলে।

খাদ্য সমস্যার দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ম্বর- *আগে কবিরা কবিতা লিখতেন এ দেশের নিরন্ন অভাবগ্রস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে। যেমন,*

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
চায় শুধু ভাত একটু নুন
বেলা বয়ে যায় খায়নি কো বাছা
কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।

এখন এ দেশের মানুষ যারা হতদরিদ্র তারাও না খেয়ে মরে না। যখন এ দেশের (পূর্ব পাকিস্তান) জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি, প্রতিদিন একমুঠো খাবার না পাওয়ার সংখ্যা ছিল অনেক। তখন এখানে খাদ্যশস্য জন্মাত বড়জোড় তিন লক্ষ টন। কিন্তু এখন জনসংখ্যা ষোল কোটি। কিন্তু মানুষ হাভাতে থাকে না। কারণ কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এখন ফসল হয় ১০ থেকে ১৩ লক্ষ টন। দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উদ্বৃত্ত। ফলে রপ্তানি করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সরকারি মদদ ও কৃষিবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন এবং কৃষির আধুনিকায়ন এ উন্নয়ন সম্ভব করেছে। এখন দেশে কার্তিকের মঙ্গা হয় না। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, মৎস্য চাষে বিপ্লব, পোলট্রি খামারের বিশাল বিস্তার ডিম ও মাংসের সরবরাহকে বিপুলভাবে বাড়িয়েছে এবং দেশের আমিষের চাহিদা মিটাচ্ছে ব্যাপকভাবে। এটা কি স্বাধীনতার সুফল নয়। মাছে ভাতে বাঙালি এ প্রবচন আবার সত্যরূপ লাভ করেছে।

বস্ত্র সমস্যার সমাধান- বাংলাদেশের কঠিন শত্রুও বলবে না যে বাঙালিরা বস্ত্রহীনতার সমস্যায় আছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের তৃতীয় পোশাক রপ্তানীকারক দেশ। পাকিস্তান আমলে এ দেশের সকল মিল কারখানার মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ধনী ব্যক্তি। বাঙালিরা ছিল শুধু শ্রমিক। সকল পাটকলের পাট উৎপাদন ও যোগান দিত বাঙালিরা কিন্তু আয়ের পুরোটা যেত পশ্চিম পাকিস্তানের ঘরে। আজ পোশাক খাত হলো এক নম্বর বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস। আমাদের পাটকল ও টেক্সটাইল মিলের মালিক আমরা। পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশের শুধু দরিদ্ররাই নন বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বড় অংশের পোশাকের চাহিদা মিটানো হতো বিদেশী পুরাতন কাপড় দিয়ে। সে অবস্থা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি অনেক আগেই। এখন আর কেউ নিক্সন মার্কেট নামের ফুটপাতে বিদেশী পুরাতন কাপড় কিনতে যায় না। সস্তায় দেশী কাপড় কিনতে মানুষ বঙ্গবাজার যায়। এবং বিদেশীরাও এ দেশে এসে এ কাজটি করে।

বাসস্থান সমস্যা- বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা এ দেশে একজনও গৃহহীন থাকবে না। এটা যে শুধু কথা নয় তা প্রমানিত। একসময় গ্রাম এলাকায় গেলে ভাঙা কুটির, খড়ের ঘরের সংখ্যাই বেশী চোখে পড়ত। রোদে বৃষ্টিতে ঝরে এ দেশের দরিদ্র শ্রেণির মানুষ কত কষ্টই না করত। কিন্তু সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, নদী ভাঙনের ফলে গৃহহীনদের জন্য অগ্রাধিকার হিসেবে সরকারি খরচে গৃহের ব্যবস্থা হচ্ছে। এত গেল গরীব মানুষের কথা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত দশ বছরে এ দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা দরিদ্র সীমা থেকে যারা বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের গৃহায়ণ অবস্থার যে উন্নয়ন হয়েছে তা চোখে পড়ার মতো। ঢাকা শহর বা অন্য জেলা উপজেলা পর্যায়েও এখন উঁচু আবাসিক ভবন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক ভবন। গ্রামের চিত্র তো একেবারেই পাল্টে গেছে। আগে যেখানে কোনো গ্রামে গেলে দেখা যেত ধনী ও সচ্ছল লোকদের টিনের ঘর, তার নিচের লোকদের খড়ের ঘর। এখন খড়ের ঘর নেই। টিনের ঘরগুলো হয়েছে দালান।

শিক্ষার উন্নয়ন- স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে তিন/চার গ্রাম মিলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। আবার অনেক এলাকায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল না। আবার যা ও ছিল তা ছিল ভাঙাচোরা ঘর। শিক্ষক মেট্রিক বা নন-মেট্রিক। এখনকার চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। প্রায় প্রতি গ্রামে বা অত্যন্ত দু-গ্রাম মিলে এখন একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষকগণ উচ্চশিক্ষিত। শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক। উপরন্তু মেয়েদের জন্য প্রতিমাসে সরকার কর্তৃক দেওয়া হচ্ছে উপবৃত্তি এর ফলে নারীশিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে লক্ষণীয়ভাবে। আমরা যদি পাকিস্তানের দিকে তাকাই, শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা আমাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। পাকিস্তান আমলে গ্রাম পর্যায়ে বা থানা পর্যায়ে কোনো কলেজ বা উচ্চশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, হয়তো দু'একটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে। এখন থানা পর্যায়ে একাধিক কলেজ। প্রায় সব বিদ্যায়তন ভবনগুলো এখন সুরম্য অট্টালিকা। শিক্ষার হার এখন ৭০% এর ওপর। পাকিস্তান অমলে বা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষার হার ছিল ২০-৩০ শতাংশের ভিতর। এসব উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ বলে। কারণ সরকারগুলো জনকল্যাণে স্বাধীনভাবে উন্নয়নমুখি কর্মসূচি নিতে সক্ষম।

স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন- মানুষের দোর গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা। এই স্লোগানকে কার্যকরভাবে বাস্তবে রূপদান করে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচকগুলোকে বিশ্বদরবারে প্রশংসনীয় পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তান আমলে গ্রামের লোকজন এমবিবিএস ডাক্তার কী তা জানার খুব একটা সুযোগ পেত না। থানা পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। স্বাধীনতা উত্তরকালে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক নানা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সার্বিকভাবে পুরো স্বাস্থ্য সেবায় একটা ইতিবাচক ফল জনগণ পাচ্ছে। এখন এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় আমাদের শিশু মৃত্যুহার, প্রসূতি মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। দেশের সেনিটেশন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ জনপদে স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক কমেছে। এখন শুধু উপজেলা পর্যায়েই উন্নত সরকারি স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন হয়নি তা কম্যুনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এখন আর প্রসূতিদের সন্তান প্রসবের জন্য গ্রামের অদক্ষ ও নিরক্ষর দাইয়ের ওপর নির্ভর করতে হয় না, উপজেলা সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছাড়াও বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের সেবা পাওয়া যাচ্ছে। আর এতসব উন্নত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির ফলেই বাঙালিদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে এখন সত্তর বছরের ওপর । পাকিস্তান আমলে আমাদের গড় আয়ু ছিল ৪০-৪৫ বছর।

যোগাযোগ ব্যবস্থার ঈর্ষণীয় উন্নয়ন- পাকিস্তান আমলের কাঁচা রাস্তার স্থান দখল করেছে পিচঢালা পথ। একসময় গাঁয়ের ক্ষেতের আইল ছিল মানুষের চলাচলের পথ। বর্ষায় কাঠের নৌকা বা কলাগাছের ভেলা, তালগাছের খোল ছিল এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়া, স্কুল কলেজে ছাত্রদের পানি মারিয়ে আসা-যাওয়ার চিরচেনা চিত্র। এখন অনেক গ্রামীণ জনপদ পাকা রাস্তায় এক গ্রাম অন্য গ্রামের সাথে সংযুক্ত। এমন কি যন্ত্রচালিত গাড়ি নিয়ে শহর থেকে

সহজেই গ্রামের নিজ বাড়িতে যাওয়া যায়। সারা বাংলাদেশে সড়ক নেটওয়ার্কে একটা যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটেছে। একটা ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, ১৯৭৪ সাল, আমি যাব রাজশাহী। জীবনে প্রথমবারের মতো ঢাকার বাইরে যাওয়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রিয় বন্ধু মাজহারকে দেখতে। তখন ঢাকা থেকে একমাত্র বিআরটিসি'র একটি বাস রাজশাহী যেত। বেসরকারি পরিবহন সিস্টেম তখনও বর্তমান অবস্থার মতো চালু হয়নি। আরিচা-নগরবাড়ি ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া বাসটি রাজশাহী পৌঁছাতে রাত প্রায় ৯/১০ টা বেজে যায়। কিন্তু এখন কী অবস্থা সড়ক যোগাযোগের তা সবারই জানা। স্বাধীনতার পরে সরকারগুলো বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। আর এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখছে। এখন ঢাকার সাথে সারা দেশের একটা সুষ্ঠু যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে। এবং ইহা সড়ক, নৌ, রেল এবং আকাশ পথে সার্বিকভাবে হচ্ছে। পাকিস্তানী সরকারদের পঁচিশ বছরে এ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র কী ছিল তা ভুক্তভুগি মাত্রই জানে। পঁচিশ বছরে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের চাকা থেমে থাকেনি। তা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে।

বিদ্যুৎ ও তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন- পরিবহন সেক্টরের উন্নয়নের পাশাপাশি অবশ্যই উল্লেখ করার মতো উন্নয়ন হয়েছে বিদ্যুৎ ও তথ্য প্রযুক্তিগত সেক্টরে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, এটা এখন আর কোনো মুখরোচক স্লোগান নয়, দিবালোকের মতো বাস্তব। এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুড়েঘরের অতি দরিদ্র মানুষটিও বিদ্যুতের আলোতে চলাফেরা করে। হয়তো এই বিষয়ে আরও উন্নয়ন প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে। আমরা এখন থেকে স্বাধীনতা পূর্ব বা নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের চিন্তা করলেও বুঝতে পারব কী কঠিন সময় অতিক্রম করে আমরা বর্তমানের আলো ঝলমল অবস্থায় উপনীত হয়েছি। একই সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একটা উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। এখন ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়েও চট জলদি তথ্য আদান-প্রদানে কম্পিউটার ব্যবহার ও ইন্টারনেটের সাহায্যে মানুষ প্রয়োজনীয় কাজটি করতে পারছেন। এখন আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের যুগে বসবাস করছি। এখন গ্রামের একজন দরিদ্র বা স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁর মুঠোতে সারা বিশ্বকে নিয়ে ঘুরছে, নিমিষেই সে জানতে পারছে চলমান বিশ্বের নানা ঘটনা। স্কুল পর্যায়েও শিক্ষা কার্যক্রমে চালু হয়েছে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার। এর ফলে সার্বিক জীবমানের ব্যাপক গুনগত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। গ্রামের অনেক মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত একজন মানুষের ঘরে টেলিভিশন, ফ্রিজ, বিদ্যুৎ চালিত পাখা বা এয়াকুলার এখন আর কোনো বিলাসিতা হিসেবে গন্য হয় না। আকাশপথে আমাদের বঙ্গবন্ধু সেটেলাইট এই প্রযুক্তি ব্যবহারকে আরও অগ্রসর করেছে। দেশের বিভিন্নমুখি উন্নয়নে বিদ্যুৎ ও তথ্য প্রযুক্তি আমাদের অগ্রযাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করছে। একইসঙ্গে আমরা পাকিস্তানের এই ক্ষেত্রের তুলনা করলেও দেখতে পাব, আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি তাদের থেকে আমাদের দেশকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তান সিভিল ও মিলিটারী কর্মক্ষেত্রে বাঙালি ও বর্তমান

পঁচিশ বছরের ধারাবাহিক পাকিস্তানী শাসনের অধীনে সিভিল ও মিলিটারী কর্মক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল প্রায় অপাঙতেয়। সেই সময়ের শাসকচক্র ও মিলিটারী আমলাতন্ত্র একটা বিষয়ই বাঙালি তথা পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে বোঝাতে চেয়েছে যে বাঙালিরা শারীরিকভাবে দুর্বল তাই প্রতিরক্ষা কোনো চাকুরির জন্য উপযুক্ত নন। তাই দেখা গেছে শতকরা ৫ ভাগের কম চাকুরি পেয়েছে বাঙালি যুবকরা। আর সিভিল প্রশাসনেও ছিল একই অবস্থা। তাঁদের ধারণা ছিল বাঙালিরা মেধায় নিম্নমানের তাঁরা প্রশাসনের কাজে দক্ষতা দেখাতে পারবে না। তাই প্রথম শ্রেণির সরকারি চাকুরির ৯০ ভাগই ছিল ওদের দখলে। বাঙালিদের করুণা করে ৫-১০শতাশং চাকুরির সুবিধা দিত। কিন্তু ৭১ এর স্বাধীনতার পর বাঙালি যুবকরাই দক্ষতার সাথে বাংলাদেশকে পরিচালনা করছে এবং এগিয়ে নিচ্ছে দেশকে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ তাঁদের মাতৃভূমির সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীতে পাকিস্তানকে টেক্কা দিয়ে সুনামের সাথে কাজ করছে। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদাসম্পন্ন বাহিনী হওয়ার কারনেই এ সম্মানজনক সুযোগ আমরা পাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই অসংখ্য শিক্ষিত মেধাবি তরুণগণ চাকুরির সুযোগ পাচ্ছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনত্তোর অবস্থা- একটা সময় ছিল পাকিস্তান আমলে যখন শাসককুল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও তা বাস্তবায়নকারীগণ বোঝাতে চেয়েছেন বাঙালিরা খেলাধুলা বা ক্রীড়ার নানাক্ষেত্রে উপযুক্ত নন। ক্রিকেট এবং হকিতে পাকিস্তান বিশ্বে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিল। কিন্তু এই দু'টি ক্রীড়ায় বাঙালি সন্তানদের অংশগ্রহণ প্রায় ছিল না বললেই চলে। একচেটিয়া আধিপত্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের। শুধু ফুটবল খেলায় পূর্ব পাকিস্তান তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগে কিছুটা বিচরণশীল ছিল। কিন্ত আমাদের যে সক্ষমতা ছিল সব খেলায়, যোগ্যতা প্রমাণের তা আমরা দেখাচ্ছি স্বাধীনত্তোর সময়কালে। এখন তো ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশের টাইগাররা একটা সমীহজাগানিয়া অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। পাকিস্তানসহ তাবৎ ক্রিকেট শক্তিকে আমাদের ছেলেরা একাধিকবার পরাজিত করেছে। সিরিজ জিতেছে, হোয়াইট ওয়াস করেছে। আমাদের স্বাধীনতাই আমাদের শক্তি, বাঙালি জাতি যে কোনো ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম তা তাঁরা প্রমাণ করছে। আমাদের দীর্ঘদিনের উপেক্ষার জবাব দেওয়ার শক্তি দিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের এক তরুণ ক্রিকেট বিশ্বে সব ভার্সনে এক নম্বর খেলোয়ার। একাত্তরে প্রাপ্ত স্বাধীনতা আমাদের গর্ব ও প্রেরণার উৎস।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে– পশ্চিম পাকিস্তানী ও তাঁদর বঙ্গীয় পা চাটা দোসরগণ আমাদের সামন্যতম স্বাধীনতাটুকুও হরণ করতে তৎপর ছিল। তাঁরাতো আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকেই চিরতরে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা রক্ত দিয়ে রুখে দিয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁরা প্রায় নিষিদ্ধ করার উপক্রম করেছিল। যে রবীন্দ্রনাথ আপামর বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের নানা অনুষঙ্গে মিশে আছে, যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সঙ্গীত ও সাহিত্যের নানা ধারা দিয়ে বাঙালির জীবনকে প্রভাবিত করে যাচ্ছেন তাঁর চর্চা করা যাবে না। কী যে দুঃসময় ছিল আমাদের সে সময়। একটা কৌতুক আছে গভর্নর মোনায়েম খাঁ না কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক জনাব আঃ হাই সাহেবকে ডেকে বরেছিলেন, আপনি নিজে রবীন্দ্র সঙ্গীত লিখতে পারনে না। রসিক অধ্যাপক না কি জবাব দিয়েছিলেন, পারি তো, তবে তা রবীন্দ্র সঙ্গীত হবে না, হাই সঙ্গীত হবে। কিছু মুখচেনা বিজ্ঞজন তো নজরুলের কবিতা গানকেও সম্পাদনা করে তাঁদের মনমতো শব্দ বসিয়ে দিত। এই ছিল আমাদের অবস্থা। আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও লাভ করেছি। এখন আর রবীন্দ্র নজরুল চর্চায় কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

একাত্তরের স্বাধীনতা পরবর্তী আমাদের দেশের ও দেশের মানুষের জীবনমানের যে উন্নতি ও পরিবর্তন তার ফিরিস্তি হয় তো আরও লম্বা করা যায়। তবে আমরা যারা স্বাধীনতা পূর্বকালে জন্মেছি তাঁরা পাকিস্তানী শাসনও শোষণ বঞ্চনার কিছুটা প্রত্যক্ষ দর্শক এবং ভোক্তা। তাই আমরা স্বাধীনতার স্বাদ কী তা বুঝতে পারছি। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মও ইতিহাস থেকে এবং বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের সুযোগে বাঙালিদের অতীত ও বর্তমানকে জানতে ও বুঝতে শিখেছে। আমরা এখন স্বাধীনতা পরবর্তী এই আটচল্লিশ বছরে অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে গর্বিত অর্জন লাভ করেছি সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারি।

ছিটমহল সমস্যার সমাধান- সাতচল্লিশের ভারত বিভক্তিকালে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় শতাধিক ছিটমহল সমস্যার উদ্ভব হয়। পূর্ব পাকিস্তনের অনেক ভূমি ও জনগণ ভারতের ভিতর আবার ভারতের ভূমি ও জনগণ আমাদের ভূখন্ডের ভিতর ছিল। এসব এলাকার জনগণের নাগরিকত্ব বিষয়টি ছিল অমীমাংসিত। তাঁরা ছিল না ঘরকা না ঘাটকা মানে না তাঁরা ভারতীয় না পাকিস্তানী এবং পরবর্তীতে না বাংলাদেশী। এরা দীর্ঘ সময় ধরে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল, মানবেতর জীবন যাপনই ছিল তাঁদের ললাট লিখন। পাকিস্তান আমল গিয়েছে, কত সরকার এসেছে, এমন কি বাংলাদেশ স্বাধীতার পরও দীর্ঘ সময় কয়েকটি সরকার দেশ শাসন করেছে কিন্তু এই মানবিক সমস্যা নিয়ে কেউ কোনো সমাধানমূলক কার্যক্রম নেয়নি। কিন্তু সেই সমস্যারও সমাধান হয়েছে প্রায় ৬৯ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। এ ধরণের আন্ত-রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের জন্য যে স্বাধীনচেতা মনোভাব, দরকষাকষির ভিত্তি ও কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন তা স্বাধীন রাষ্ট্রীয় অবস্থান না থাকলে সম্ভব হতো না।

ফারাক্কা বাঁধ সমস্যার সমাধান- এই আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সমস্যার ও সৃষ্টি পাকিস্তান আমলে। আন্তর্জাতিক আইনকে তোয়াক্কা না করে ভারত পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং বংলাদেশের পশ্চিমাংশ মরুকরণের কবলে পড়ে যায়। যদিও বাঁধটি খোলা হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকার আলোচনার ভিত্তিতে ও সৌহার্দ্যমূলক সমঝোতার ভিত্তিতে এর একটি সমাধান করেন।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি- পাকিস্তান আমলে এ সমস্যার শুরু। রাঙামাটিতে কর্ণফুলি নদীতে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে এ সমস্যার উদ্ভব হয়। পার্বত্য এলাকার এক বিরাট জনগোষ্ঠি এই বাঁধের ফলে তাঁদের বাড়িঘর, জমিজমা সব হারায় পানির তলে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁদের যথাযথ পূনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পুরনো সমস্যার সাথে তাঁদের জাতিগত স্বীকৃতি ও ভূমি সমস্যা এবং বিভিন্ন জেলার ছিন্নমূল মাসুষকে পার্বত্য এলাকায় পূনর্বাসিত করায় দীর্ঘ মেয়াদী রক্তক্ষয়ী বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে পার্বত্য এলাকার বিরাট সংখ্যক লোক। ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে।

সমুদ্রসীমার বিরোধ মিমাংসা- ভারত ও মায়ানমারের সাথে আমাদের বঙ্গোপসাগরের সীমা নিয়ে সাতচল্লিশের পর থেকে বিরোধ চলছিল। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এ সমস্যা নিয়ে তেমন কোনো কাজ করেনি। পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের বিষয় বিধায় তাঁরা এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। ফলে অবৈধভাবে এ দুই প্রতিবেশী দেশের সরকার ও জনগণ আমাদের ন্যায্য হিস্যার সম্পদ আহরণ ও ভাগ করতে থাকে। দীর্ঘ আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হলে এবং উভয় দেশ ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে নালিশ করে। আদালতের রায়ের ফলে বাংলাদেশ সাগরে এক বিশাল জলসীমার মালিকানা প্রাপ্ত হয় যা আমাদের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও স্বাধীন দেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনি সক্ষমতার সুযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে। এমন আরও অর্জন আছে যা আমাদের জাতির সমৃদ্ধির দ্বার উন্মোচন করেছে। স্বাধীনতার নানাবিধ সুফল দেশের নাগরিকদের ভোগের জন্য অবারিত করেছে।

স্বাধীনতা ও অবাঞ্চিত কিছু প্রাপ্তি– আসলে ভালো কিছু চাইলে এর সাথে স্বাভাবিক নিয়মে হয়তো কিছু খারাপও চলে আসে। কোনো কাজের বা অর্জনের সুফলের সাথে সামান্য নেতিবাচক বিষয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে দীর্ঘ সময়ের নানা পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও জনগণের অংশগ্রহণ তারসাথে সরকারি পদক্ষেপ ও জনকল্যাণে আন্তরিকতার ফলে দেশ অনেক সুফল ভোগ করছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কিছু ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া জাতীয় জীবনে নেতিবাচক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে এই স্বল্প পরিসরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকায় কয়েকটি বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই।

আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের একটা অন্যতম লক্ষ্য ছিল একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সমাজ ব্যবস্থা। আমরা স্বাধীনতার প্রাপ্তির সূচনালগ্নে শুরুটাও করেছিলাম গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায়। কিন্তু অল্পসময়েরই তা হোচট খায়। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকাতা বিনষ্ট হয় পর পর কয়েকটি সামরিক শাসনের ফলে। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির জনককে হত্যার মাধ্যমে একটা অপরাজনীতির ধারা চালু হয়। সামরিক শাসন কোনো রাষ্ট্রেই দীর্ঘমেয়াদী কোনো উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি, আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আমাদের উন্নয়নের চাকা বার বার থেমে গেছে। কিন্তু তা কাম্য ছিল না।

একাত্তরে যারা সরাসরি আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে এবং সশস্ত্রভাবে মোকাবেলা করে আমাদের প্রতিহত করতে চেয়েছে মাত্র চার/পাঁচ বছরের ব্যবধানে তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে, তাদের গাড়িতে উড়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের কষ্টার্জিত লাল সবুজ পতাকা। এটা যেমন ছিল দুঃখ ও কষ্টের বিষয় আবার ছিল আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির দুর্বলতা ও ব্যর্থতা।

পাকিস্তান আমলে যা এতটা প্রকটভাবে দৃশ্যমান ছিল না তা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অব্যাহত ভাবে এ দেশে বিস্তার লাভ করেছে, তা হলো সীমাহীন দুর্নীতি। এক শ্রেণির রাজনীতিক, সরকারি আমলা থেকে শুরু করে সমাজের প্রায় প্রতি স্তরে দুর্নীতির বিষবাস্প আমাদের কষ্টের সব অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। দেশে একটা লুটেরা, ব্যাংকঋণ খেলাপি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জনগনের টাকা শিল্পায়ন ও ব্যবসার নামে নিয়ে বিদেশে পাচার করে বা আত্মসাৎ করে দেশের উন্নয়নের ক্ষতি করছে। এ নেতিবাচক চরিত্রের উত্থান কখনো কাম্য ছিল না। এর কুফল ভোগ করছে সারা জাতি।

রাজনীতিতে এক ধরণের দুর্বৃত্তায়নের উদ্ভব হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্র ও যুব রাজনীতিতে একশ্রেণির লোভী ও চরিত্রহীন ও দেশপ্রেম বিবর্জিত লোকদের আগমন ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের ছাত্র ও যুবরাজনীতি যাদের হাতে, দেশবাসী কিছুটা হলেও শঙ্কিত ভবিষ্যতে দেশের শাসনভার কাদের হাতে যাবে।

পরিবেশ দুষণ এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। শিল্পায়নের নামে নদী দখল ও দুষণ দেশের পরিবেশকে বিপর্যয়ের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের জন্য দেশ, মানুষের জীবন তো এখন হুমকির মুখে। মানুষ না বাঁচলে এ দেশ এ উন্নয়নের স্বার্থকতা কোথায়।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, ধর্মের নামে জঙ্গিবাদের উত্থান আরেকটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এ দেশে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য। কিন্তু সে লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করার একটা অপচেষ্টা চলমান আছে যা কাম্য ছিল না এবং তা আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। যাক নেতিবাচক বিষয়ের তালিকাটি আরও বড় করা যায়, এর কারণ বিশ্লেষণ করা যায়। তবে এ লেখায় তা সম্ভব নয় বলে এখানেই থামি।

শেষ কথা- শুরু করেছিলাম স্বাধীনতার সুফল নিয়ে আলোচনা। আমরা বহদূর এগিয়েছি। আরও অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যদি কিছু নেতিবাচক বিষয় আমদের সমাজকে গ্রাস করতে উদ্যত না হতো। তবু পাকিস্তান নামক দেশটির কুশাসন ও বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালিকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিকের মর্যাদায় অভিসিক্ত হওয়াটা আমাদের অর্জনের একটা বড় দিক। ২০২১ সালে জাতি তার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি উদযাপন করবে। নানা প্রতিকূলতা, দেশী ও বিদেশী নানা ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেশ এগিয়ে যাবে। আমাদের আছে কর্মমুখি জনগণ, আছে বেশ কিছু পরিশ্রমী ও ত্যাগী নেতা যারা সত্যিকার অর্থেই দেশকে ভালোবাসেন। একজন প্রকৃত জনপ্রতিনিধি যদি নিষ্ঠাবান হন, জনকল্যাণে নিবেদিত হন স্বাধীনতার সুফল প্রকৃত অর্থেই জনগণ পাবে। আড়াইহাজার উপজেলাকে যদি একটা উন্নয়নের মডেল হিসেবে ধরি তবে বাংলাদেশের চিত্রটা উজ্জ্বলভাবে সামনে আসে। একজন এমপি যে তাঁর এলাকার প্রাতিষ্ঠানিক, কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে পারেন আড়াইহাজারের উন্নয়ন তার একটি উদাহরণ। যখন গ্রামে যাই, এটাকে আর গ্রাম মনে হয় না। সব যেন গ্রামীণ শহর। গ্রামে বসে মানুষ এখন স্বাধীন বাংলায় নগরের নাগরিক সুবিধা ভোগ করছে তা দেখে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খুব ভালো লাগে। পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব ইমরান খান তাঁর দেশের পালামেন্টে বক্তৃতায় বলেছেন, 'বাংলাদেশ এখন যে অবস্থানে আছে, পাকিস্তানের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আগামী দশ বছরে সে স্থানে পৌঁছানো। বলা যায় স্বাধীনতার পর এই বিগত সময়ে আমাদের দেশ পাকিস্তানের চেয়ে দশ বছর এগিয়ে গেছে। এটাই কি আমাদের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় সুফল নয়?

বাছেত খান– বীর মুক্তিযোদ্ধা, কবি ও সাহিত্যিক, প্রাক্তন মহাপরিচালক-অডিট ডিপার্টমেন্ট
পরিচালক-রূপালী ব্যাংক লিমিটেড।

সাত লক্ষ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আপনার জন্যেই

মহিতুল ইসলাম হিরু

ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে, রোদ-বৃষ্টি ও ঝর-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে যিনি মানুষের জন্য দিনমান কাজ করে চলেন তিনিই তো সত্যিকারের কর্মবীর। দিনের আঠারো ঘন্টাই যিনি জনগণের পেছনে ছুটে চলেন, অসহায়-বঞ্চিত-পীড়িত মানুষের কথা শোনেন, খুঁজে খুঁজে কাজ করেন তিনি নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু। গত এগারো বছরে তিনি আড়াইহাজার উপজেলায় রেকর্ডসংখ্যক উন্নয়ন করেছেন। জেলার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জনপদ আড়াইহাজারকে তিনি উন্নয়নের যাদুরকাঠিতে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। এ উপজেলার প্রত্যেকটি গ্রামকে তিনি পাকা রাস্তায় সংযুক্ত করেছেন। নতুন নতুন রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এই জনপদে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিয়ে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান। মানুষের জীবনযাত্রার সার্বিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সরাসরি উপকার পায় এমন অগণিত কাজেও মনোনিবেশ করেন তিনি। সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত এলাকা নিশ্চিত করতে যুবসমাজকে কর্মমূখী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আধুনিক জীবন যাপনের সব উপকরণ সহজলভ্য করতে উপজেলাকে ঢেলে সাজিয়েছেন তিনি। উন্নয়নের বাইরেও নজরুল ইসলাম বাবু আরেক মহান মানুষ হিসেবে উপজেলার সর্বমহলে সমাদৃত। তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে এলাকাবাসী কারও পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয় না। যে কোনো বয়সের যে কোনো শ্রেণী পেশার মানুষ তাঁর সাথে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন। উপজেলার প্রতিটি মানুষের সমস্যার কথা শুনে তা তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা করেন তিনি। আর এজন্যই সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা গরিব-দুঃখী মানুষের হৃদয় জয় করতেও সমর্থ হয়েছেন তিনি। যতক্ষণ পর্যন্ত না কারও সমস্যা সমাধান না হয় ততক্ষণ অবধি তিনি তার খোঁজ খবর নেন। অতীতে কোনো সাংসদকে কাছে পেতে এলাকার জনগণকে রাজধানী ঢাকায় গিয়ে দিনের পর দিন ধরনা দিতে হতো। কিন্তু দেখা মিলত না। যদিও বা কদাচিৎ এলাকায় আসতেন আবার দ্রুতই ফিরে যেতেন ঢাকায়। তিনিই বোধ হয় ব্যতিক্রম এক নেতা যিনি ঢাকা ছেড়ে গ্রামের মাঠে-ঘাটে পাড়ামহল্লায় সময় কাটাতে ভালোবাসেন। মানুষের মন রক্ষা করতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় ব্যয় করে চলেন তিনি। এলাকার মানুষের আস্থা, নির্ভরতা ও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছেন এই মহান মানুষটি। সত্যিকার অর্থে জনগণই যাঁর ধ্যানজ্ঞান, জনগণই যাঁর সাধনা তিনিই তো পারেন জনগণের মনের মণিকোঠায় পৌঁছুতে।

নজরুল ইসলাম বাবু আড়াইহাজার উপজেলায় যে পরিমাণ উন্নয়ন করেছেন তা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে গেলে লেখার কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই উন্নয়নের ফিরিস্তি না টেনে এতটুকু বলতে চাই গত এগারো বছরে তিনি যা করেছেন তা উন্নয়নের ইতিহাসে বিরল। জনগণের মুখে এখন একটি কথার প্রচলন হয়ে গেছে। কথাটি হলো- যা করেনি অতীতের সাত এমপি, তার চেয়েও বেশি করেছেন নজরুল ইসলাম বাবু এমপি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে দলমত নির্বিশেষে সবাই যখন তাঁর এই উন্নয়নের কথা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়ে প্রশংসা করেন তখন গুটিকয়েক জনবিচ্ছিন্ন লোক এই নজরুল ইসলাম বাবুর নামে মিথ্যাচার ও কুৎসা রটাতে ব্যস্ত। কিছু সস্তা মিডিয়া তাঁর নামে ব্যাপক বেফাঁস কথাবার্তা লিখে চরিত্র হননের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা খুবই দুঃখজনক। জনগণের সাথে যাদের কোনো যোগাযোগ নেই, এ পর্যন্ত কোনো মানুষের উপকারে আসতে সক্ষম হয়নি এবং উপজেলার ভালো কোনো কর্মকান্ড করতে আজ অবধি দেখা যায়নি তারাই উন্নয়নের প্রাণপুরুষ খ্যাত নজরুল ইসলাম বাবু'র বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ কিছু সস্তাদরের পত্রিকায় অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই হীন কর্মকান্ডে উপজেলার মানুষ যারপরনাই ক্ষুব্ধ, ব্যাথিত, মর্মাহত। কিছু দুর্বৃত্ত যারা অতীতে রাজনৈতিক পরিচয়ে চাঁদাবাজি করেছে, সন্ত্রাসী করেছে, ডাকাতদের শেল্টার দিয়েছে এবং যারা বর্তমানে এলাকা থেকে বিতাড়িত তারাই আজ সংঘবদ্ধ হয়ে 'নজরুল ইসলাম বাবু ঠেকাও' মিশনে অপচেষ্টায় নেমেছে। আশার কথা, উপজেলার মানুষ এখন বেশ সচেতন। তারা নজরুল ইসলাম বাবু'র কর্মযজ্ঞে বিমোহিত। শিক্ষায়, শান্তিতে, শৃঙ্খলায়, উন্নয়নে এখানকার মানুষের চিন্তা চেতনা এখন অনেক উন্নত। নজরুল ইসলাম বাবু'র নেতৃত্বেই যে উপজেলাটি সারাদেশের এক রোল মডেলে পরিণত হয়েছে তা বলার অবকাশ নেই। যারা তাঁর এই উন্নয়ন কর্মকান্ডে ঈর্ষান্বিত এবং পেছনের দরজা দিয়ে এসে নেতা হতে চায় সেই উচ্চাভিলাষী ও অজস্র কালো টাকার মালিকের পোষ্যরা কখনোই যে হালে পানি পাবে না তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

নানা অপকর্মে অভিযুক্ত হয়ে নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত উপজেলার দুর্বৃত্তগোষ্ঠীকে কৌশলে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে নজরুল ইসলাম বাবু'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী একটি সিন্ডিকেট। যা এখন উপজেলার চায়ের দোকানগুলোতেও ওপেন সিক্রেট। দিন শেষে কোনো ষড়যন্ত্রই যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া উন্নয়নের দক্ষ কারিগর এই নজরুল ইসলাম বাবুকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না সেটিও আলোচনা হয় বেশ জোরেশোরে। সত্যকে যে কখনো মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না তা এখন এলাকার মানুষ ভালো করেই বুঝে। একজন জনপ্রিয় জনবান্ধব নেতার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে তারা জনগণের ধিক্কারই লাভ করেছে নিন্দিত হয়েছে। অপরপক্ষে নন্দিত হয়েছেন জনমানসে উদ্ভাসিত জননেতা নজরুল ইসলাম বাবু। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন এই নীতি অবলম্বন করে উপজেলাকে যেমন সন্ত্রাস ও ডাকাতমুক্ত করেছেন আবার শান্তিকামী মানুষদের 'অতি শ্রদ্ধেয়' ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। অত্যন্ত দক্ষ ও চৌকস এই নেতার গড়ে তোলা এলাকার দলীয় কোনো অঙ্গ সংগঠনের বিরুদ্ধে গত এগারো বছরে কোনো অপকর্মের অভিযোগ উঠেনি। এটি তাঁর নেতৃত্বের একটি আশ্চর্য দিক বলা যায়। যে যেখানে উপযুক্ত সে সেখানেই ন্যাস্ত। ছাত্র রাজনীতিতে জাতীয় পর্যায়ে সফল এই নেতা স্থানীয় রাজনীতিতেও সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন দারুণভাবে। উপজেলার কোথাও আজ অশান্তি নেই, নৈরাজ্য নেই, নেই অভাব অভিযোগ হাহাকার। তবুও যারা মিথ্যাচার রটিয়ে আড়াইহাজারের পরিচ্ছন্ন আকাশে মেঘ হয়ে উড়তে চায় তারা কালোমেঘ হয়েই থাকবে। মানুষের অন্তরে কখনো ঠাঁই পাবে না, ঠাঁই পেতে পারে না। পরিশেষে আলোর পথযাত্রী আলোর দিশারী এই মহান পুরুষের জন্য অপরিসীম ভালোবাসার ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আপনি এগিয়ে যান আপনার মতো করেই। সাত লক্ষ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আছে আপনার জন্যেই।

লেখক : কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

○ অনুপম হায়াৎ ○

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) যেমন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা তেমন তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তিভূমি 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা'র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৭ সালে এই সংস্থা গঠনের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এর আগে এই অঞ্চলে চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনো স্থায়ী স্টুডিও ছিল না। বঙ্গবন্ধু যখন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন মন্ত্রী হন তখন এদেশের সিনেমা হলে প্রদর্শিত হতো আমেরিকার হলিউড, ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া, মিশর, ইতালি প্রভৃতি দেশ এবং কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ, করাচি ও লাহোরে নির্মিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র। এই অঞ্চলে তখন কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ-সুবিধা ছিল না। অবশ্য এর আগে ১৯৩১ সালে ঢাকার নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে নির্বাক কাহিনীচিত্র 'দি লাস্ট কিস' বা 'শেষ চুম্বন' এবং ১৯৫৬ সালে আবদুল জব্বার খানের পরিচালনায় প্রথম সবাক বাংলা কাহিনীচিত্র 'মুখ ও মুখোশ' ও কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়। এসব ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

১৯৫৩-৫৪ সালে ঢাকায় জনসংযোগ বিভাগের অধীনে একটি চলচ্চিত্র ইউনিট চালু হয়। এজন্য তেজগাঁওস্থ বিজি প্রেসের সঙ্গে অস্থায়ী স্টুডিও স্থাপনা করা হয়। এই চলচ্চিত্র বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন বেতার ব্যক্তিত্ব নাজীর আহমদ (১৯২৫-১৯৯০)। ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু হন এই সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী। চলচ্চিত্র ছিল তখন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন। নাজীর আহমদ ছিলেন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ। তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ঢাকায় একটি স্থায়ী আধুনিক ফিল্ম স্টুডিও স্থাপনের দাবি তোলেন। বঙ্গবন্ধু তখন তাঁকে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরির নির্দেশ দেন জরুরি ভিত্তিতে। কারণ, তখন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশনের শেষ দিন ছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা 'চলচ্চিত্র সংস্থা' গঠন সংক্রান্ত কাগজপত্র দ্রুত তৈরি করে বঙ্গবন্ধুর কাছে দেন। অবশেষে ১৯৫৭ সালে ৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংস্থা' বিল আকারে পেশ করেন। বিলটি সামান্য সংযোজন-বিয়োজনের পর সর্বসম্মতভাবে আইন পরিষদে পাস হয়। যুগান্তকারী এই বিলের ওপর বঙ্গবন্ধু ছাড়াও পর্যালোচনায় অংশ নেন পরিষদ সদস্য আবদুল মতিন, মো. এমদাদ আলী, মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিল পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা'র চেয়ারম্যান আজগর আলী শাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল খায়ের এবং নির্বাহী পরিচালক হন নাজীর আহমদ। সরকারিভাবে এ ধরনের চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের জন্ম ছিল পৃথিবীতে প্রথম। ১৯৮৫ সালের ১৬ই জানুয়ারি সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকায় প্রকাশিক এক সাক্ষাৎকারে নাজীর আহমদ এই লেখককে বলেছিলেন:

'...তাঁর (বঙ্গবন্ধু) উৎসাহ না থাকলে বোধ হয় এদেশে এফডিসির জন্ম হতো না। আর জন্ম হলেও হতো অনেক দেরিতে।'

চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার পরপরই বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী থাকাকালে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের সাথে অনেকগুলো গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব সিদ্ধান্তের ফলে দ্রুত চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়, নির্মিত হতে থাকে একের পর এক চলচ্চিত্র, নতুন প্রযোজক-পরিচালক, শিল্পী, কুশলীরা এগিয়ে আসে নতুন পেশায়, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি প্রযোজক-পরিচালকরাও এখানে ছবি নির্মাণ করতে আসে। প্রতিষ্ঠার পর এফডিসিতে কয়েকটি জীবনবাদী ও সৃজনশীল ছবির কাজ শুরু হয়। এসবের মধ্যে ছিল- ফতেহ লোহানীর 'আসিয়া', আখতার জং কারদারের (পশ্চিম পাকিস্তানও যুক্ত রাজ্যবাসী) 'জাগো হুয়া সাভেরা', মহীউদ্দিনের 'মাটির পাহাড়', এহতেশামের 'এদেশ তোমার আমার' পশ্চিম পাকিস্তানি জনৈক পরিচালকের 'হামসফর'। বঙ্গবন্ধু ওই সময় মহান ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণেরও ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ফতেহ লোহানীকে নির্দেশও দিয়েছিলেন বলে কামাল লোহানী সূত্রে জানা যায়। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিত্বের সময় শুরু হওয়া চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে 'আসিয়া'

পরে শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট পদক (১৯৬০) পায়। 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'জাগো হুয়া সাভেরা' মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় (১৯৫৯) পায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ পদক। অন্যান্য ছবিগুলো পায় প্রশংসা। ১৯৫৯ সাল থেকে এফডিসি থেকে নিয়মিতভাবে ছবি মুক্তি পেতে থাকে এবং তা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল এফডিসি প্রতিষ্ঠার দিনটির স্মরণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১২ সালে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

দুই.

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। বঙ্গবন্ধু সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও ষড়যন্ত্রকারীরা বেছে নেয় অগণতান্ত্রিক ও নৃশংসতার পথ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারা আক্রমণ চালায় নিরীহ বাঙালির ওপর। ২৬ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। অতঃপর অব্যাহত বিশ্বজনমতের চাপে বাঙালির মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ ও দাবির মুখে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ফিরে আসেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে।

বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির এই সংগ্রামমুখর ঘটনাবলি ১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বিধৃত হয়ে আছে দেশি-বিদেশি মুভি ক্যামেরায়। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, প্রতিবাদ, জনসভা, সংবর্ধনা, অসহযোগ আন্দোলন, সাক্ষাৎকার, ৭ মার্চের ভাষণ চলচ্চিত্রের উপাদান হয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রে এসব ব্যবহৃত হয়েছে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বপরিবারে শহিদ হওয়ার দিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র নানা আলোকে উদ্ভাসিত। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় চলচ্চিত্র নতুন করে ভিত্তি ও ব্যঞ্জনা পায়। এসময় বাড়তে থাকে নতুন চলচ্চিত্রের সংখ্যা। নির্মিত হতে থাকে নব্যধারা ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র, অসাম্প্রদায়িক চেতনার চলচ্চিত্র। অন্যদিকে পুনর্গঠিত হয় এফডিসি, সেন্সর বোর্ড, ডিএফপি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, সংযোজিত হয় সেন্সর নীতিমালা, গঠিত হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রচেষ্টা চলে ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার, বিদেশে প্রেরিত হয় চিত্র প্রতিনিধি দল, বিদেশি মেলায় ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, দেশে অনুষ্ঠিত হয় বিদেশি চিত্র মেলা, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়, নতুন প্রযোজক-পরিচালক-শিল্পী-কুশলীরা এগিয়ে আসেন এই পেশায়।

বঙ্গবন্ধুর আমলে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নবতম সংযোজন হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাহিনীচিত্র নির্মাণ। এসবের মধ্যে রয়েছে- ওরা ১১ জন (১৯৭২), অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী (১৯৭২), রক্তাক্ত বাংলা (১৯৭২), বাঘা বাঙালি (১৯৭২), ধীর বহে মেঘনা (১৯৭৩), আমার জন্মভূমি (১৯৭৩), আবার তোরা মানুষ হ (১৯৭৩), আলোর মিছিল (১৯৭৪), সংগ্রাম (১৯৭৪)। 'সংগ্রাম' ছবিতে বঙ্গবন্ধুকে দেখা যায়। সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অন্যদিকে মুক্তি পায় 'জয়বাংলা' (১৯৭২)। এছাড়া তাঁর আমলে নির্মিত হয় কালজয়ী উপন্যাসভিত্তিক 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩), 'ঈশা খাঁ' (১৯৭৪), 'লালন ফকির' (১৯৭২) এবং আরো বহু রুচিশীল চলচ্চিত্র। অন্যদিকে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজগঠনমূলক বিষয়ে অনেক প্রামাণ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্যচিত্র নির্মিত হয়। তিনি দেশীয় চলচ্চিত্রের স্বার্থে ভারতীয় ছবির আমদানি ও প্রদর্শন বন্ধ করেছিলেন। পরিশেষে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্গবন্ধু সেই পাকিস্তান আমলে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' গঠন করেছিলেন আর ১৯৭৪ সালে তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দীন ঠাকুরকে ভারতে পুনায় পাঠিয়ে ছিলেন বাংলাদেশে ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তথ্য ও জ্ঞান লাভের জন্য। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এক হয়ে আছে। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত গবেষণা হতে পারে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক

কাব্যের জমিনে শেখ মুজিব

অরণ্য সৌরভ

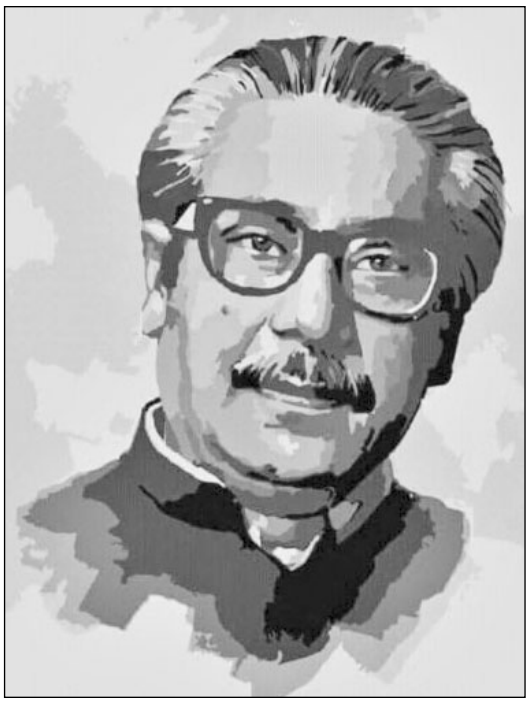

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যত কবিতা, গল্প উপন্যাস, ছড়া ও গান প্রভৃতি রচিত হয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো নেতাকে নিয়ে তা হয়েছে বলে জানা যায়নি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলোতে শুধু ব্যক্তি মুজিবই প্রতিফলিত হয়নি, কোনো কোনো কবিতা সময়কে অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধুকে করে তুলেছে কালাতিক্রমী।

নির্মলেন্দু গুণের লেখা কবিতাগুলোর মধ্যে 'স্বাধীনতা-এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কবিতায় বঙ্গবন্ধুর নাম প্রথম উচ্চারিত হয় নির্মলেন্দু গুণের কবিতায়। তাঁর একাধিক কবিতা কিংবা বলা চলে সবচেয়ে বেশি কবিতায় বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে। মুজিবকে বিবেচনায় নিয়ে ১৯৬৭ সালের ১২ নভেম্বর প্রথম তিনি কবিতা লেখেন 'প্রচ্ছদের জন্য' (পরে এটি 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থে 'স্বদেশের মুখ শেফালি পাতায়' নামে অন্তর্ভুক্ত); তখন শেখ মুজিব কারাবন্দি। ১৯৬৯ সালে রচিত 'হুলিয়া' কবিতায় নির্মলেন্দু গুণ তাঁকে নায়কের আসন দান করেন। কবি নির্মলেন্দু গুণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'সুবর্ণ গোলাপের জন্য', 'শেখ মুজিব ১৯৭১', 'সেই খুনের গল্প ১৯৭৫', 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি', 'মুজিব মানে মুক্তি', 'শেষ দেখা', 'সেই রাত্রির কল্পকাহিনী', প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন।

অন্নদাশংকর রায়ের কবিতা তো বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। তাঁর 'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা/গৌরী যমুনা বহমান/ততদিন রবে কীর্তি তোমার/শেখ মুজিবুর রহমান/দিকে দিকে আজ অশ্রু গঙ্গা/রক্তগঙ্গা বহমান/নাই নাই ভয় হবে হবে জয়/জয় মুজিবুর রহমান।' আমাদের জীবনে অনুপ্রেরণা ও শক্তি জুগিয়ে যাবে অনন্তকাল।
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তার 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে চিত্রিত করেছেন এভাবে, 'আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি/সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা/সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ-সংগীত কবিতা/জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মূল শব্দ কবিতা/রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা/আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো/আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো?'

সৈয়দ শামসুল হকের 'আমার পরিচয়' কবিতাটি তো এখন নিত্যউচ্চার্য পংক্তিমালায় পরিণত হয়েছে। কবিতায় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান?/যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান?' শামসুর রাহমানের 'ধন্য সেই পুরুষ' কবিতায় বাংলাদেশের জন্মযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন-'ধন্য সেই পুরুষ, যার নামের ওপর পতাকার মতো/দুলতে থাকে।'

এছাড়া সুফিয়া কামালের 'ডাকিছে তোমারে', সানাউল হকের 'লোকান্তর তিনি আত্মদানে, আবুল হোসেনের 'শিকারের কবিতা', জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'কোন ছবিগুলি', শামসুর রাহমানের 'যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতির্বলয়', হাসান হাফিজুর রহমানের 'বীর নেই আছে শহীদ', কায়সুর হকের 'সমষ্টির স্বপ্নের নির্মাতা', সৈয়দ

শামসুল হকের 'পিতা তোমার কথা এখন এখানে আর', দিলওয়ারের 'বিতর্কিত এই গ্রহে', বেলাল চৌধুরীর 'রক্তমাখা চরমপত্র', মহাদেব সাহার 'আমি কি বলতে পেরেছিলাম', হেলাল হাফিজের 'নাম ভূমিকায়', শিহাব সরকারের 'পিতা', অসীম সাহার 'প্রতিশোধ', সিকদার আমিনুল হকের 'আত্মজের প্রতি', আসাদ চৌধুরীর 'দিয়েছিলো অসীম আকাশ', আবু কায়সারের 'সূর্যের অনল', শান্তিময় বিশ্বাসের 'ঝড় আর মেঘের সমান', আখতার হুসেনের 'আজ থেকে তুই নিজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর', রবীন্দ্র গোপের 'আমার বুকে অর্ধনমিত পতাকা', নাসির আহমেদের 'গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশ', কামাল চৌধুরীর 'এখনো দাঁড়িয়ে ভাই', ত্রিদিব দস্তিদারের 'বাঙালির ডাক নাম', মিনার মনসুরের 'কেউ কী এমন করে চলে যায়' প্রভৃতি কবিতা থেকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা যায়।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর পশ্চিবঙ্গের কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, 'আজকের দিন যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আছে কাল, একশ মুজিব যদি মিথ্যে হয় তবুও থাকে সত্য।'

মহাদেব সাহা লিখেছিলেন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা 'আমি কি বলতে পেরেছিলাম'? তাতে তিনি বলেছেন, 'তাই আমার কাছে বার্লিনে যখন একজন ভায়োলিনবাদক/বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল/আমি আমার দুপকেট থেকে ভাঁজ করা একখানি দশ টাকার নোট বের করে শেখ মুজিবের ছবি দেখিয়েছিলাম/বলেছিলাম, দেখো এই বাংলাদেশ।'

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসীম সাহার প্রথম কবিতা 'প্রতিশোধ'। এরপর তিনি একে এক লেখেন 'আমাদের রাজকুমার ও বাংলাদেশ', 'তাঁর নিজস্ব গন্তব্যে', 'যদি রাজত্ব দাও' সহ আরো অনেক কবিতা। তাঁর বিখ্যাত পংক্তি 'পিতা হতে পারে, অবৈধ, আপবাদী/জন্ম কি তবু অবৈধ হতে পারে?/যার দেহে এই পৃথিবীতে পরিচয়/সে আমার পিতা/আমারই রক্তে বাড়ে।' কিংবা 'যতোদিন' কবিতার 'যতোদিন এই দেশমাটি আছে/আছে নদী মধুমতি/ততোদিন জাতি শ্রদ্ধা জানাবে/জনক তোমার প্রতি।'

লেখক : কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

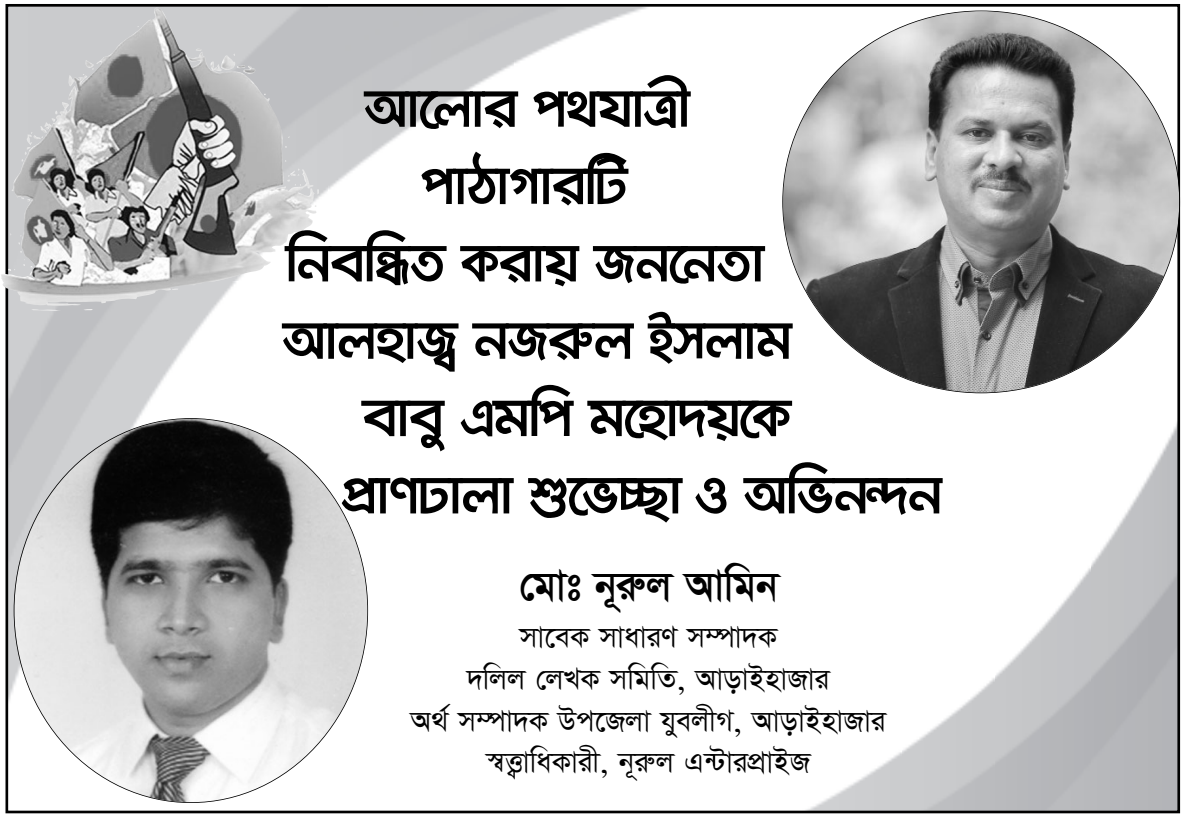

ছবি কথা বলে

ছবিটির শিরোনাম "চশমা"। ছবিটি ১৯৯৬ সালে *ACCU PHOTO CONTEST IN ASIA PACIFIC* প্রতিযোগিতায় জাপান থেকে বিশ্বের ২৩ টি দেশের ৩৫০ জন ফটোগ্রাফারের জমা দেওয়া ৯১০০ ছবির মধ্যে "চশমা" শিরোনামে *PRIZE OF EXCELLENCE* পুরস্কার লাভ করেন আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফার ও ফিল্মমেকার **সালাহউদ্দীন আজীজী**।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা যারা ছিনিয়ে এনেছে বিজয়ে এই দিনে মহান মুক্তিযুদ্ধের সে সকল শহীদ ও বীর সৈনিকদের জানাই লাল সালাম ও গভীর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মোঃ দেলোয়ার হোসেন মোল্লা

স্বত্ত্বাধিকারী

মেসার্স মদিনা কটেজ ইন্ডাস্ট্রি

গোপালদী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

কবিতাবলি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রুহুল আমিন বাবুল

পরাধীন দেশে জন্ম নিয়ে এদেশের মানুষ
স্বাধীনতা চায়। স্বাধীনতা চেয়ে
নিষ্পেষিত হয় যুগ যুগ ধরে।
আশায় আশায় গুজরান হয়
দিনের পর দিন রাতের পর রাত
যুগের পর যুগ
ক্ষয় হয়ে যায় জীবন যৌবন।

অবশেষে স্বাধীনতার বাণী আসে কানে
কণ্ঠে তাঁর ধ্বনিত হলো অমর বাণী
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!"

একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে যদি
একজন মানুষের নাম নিতে হয়
একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যদি
একজন মানুষের নাম নিতে হয়
সেই নাম একটি বেদনার নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর,
জীবনের শুরু থেকে বাঙালির প্রাণের দোসর।
মুছে দিলেন বাঙালির গ্লানির ইতিহাস
বিশ্ব-মানচিত্রের শূন্যঘরে লিখে দিলেন একটি নাম
বাংলাদেশ।

বাঙালি জাতির নব-উত্থানে
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন
নিজের শান্তি সুখের দিনগুলো বিসর্জন দিয়ে।
আমরা জানি বালেশ্বরের ব্রিটিশ কাঁপানো যুদ্ধনায়ক
বিপ্লবী বাঘা যতীনের কথা
মুর্শিদাবাদের সিরাজের কথাও আমরা জানি সবাই
আমরা জানি টিপু সুলতানের তরবারির তেজ
এবং আত্মত্যাগের কথা।

ইংরেজদের কালোহাতে নিপীড়িত হয়ে
দেশ-জাতি মাটি ও মানুষের মমতায়
ইতিহাসে অম্লান থাকবেন শত শত বছর
থাকবেন অনাদিকাল ধরে অমরতার মুকুট মাথায়
তেমনি থাকবেন বাংলার মাটি ও মানুষের প্রিয় নেতা
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
আকাশের সূর্যকে যেমন করা যায় না অস্বীকার
চন্দ্রকে যেমন অস্বীকারের পথ খোলা নেই
তেমনি একজন মানুষ
একটি চিরায়ত নাম
একটি ইতিহাস
শতাব্দী শতাব্দীকাল ধরে যিনি
পাঞ্জেরির মতো রয়ে যাবেন
আমাদের চিন্তায়-চেতনায়
আমাদের হৃদয়ের পরতে পরতে
আমাদের অহংকার ও গৌরবময় পরিচয়
সেই চন্দ্র-সূর্যের নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আশা

এ বি নুরুল হক

পড়ন্ত বেলায় পৌছেছি আজ
ইহা আমারই মনের ভাষা,
কতোদিন থাকবো দুনিয়ায় জানিনা
তারপরও করি বাঁচিবার আশা।
চলেতো যাবো একথা চিরন্তন সত্য
ইহার চেয়ে সত্য পৃথিবীতে নাই,
তারপরও দুনিয়াতে আমি অধম
দশ বছরের হায়াত আল্লাহর কাছে চাই।

অতীতকে নিয়ে দু:খ না করিয়া
ভবিষ্যতে আমি আমার সফলতা চাই,
জনকল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেবো
প্রভু তোমার কাছে এতটুকু যেন পাই।
চলে যাবো এ কথাটি শুধু আমি জানিনা
তাহা জানে সমাজের সর্বজনে,
আমাকে প্রভু এমন একজন বানাও
মানুষ যেন আমাকে রাখে তাদের মনে।

বিজয় উল্লাস

চিত্রকর মনিরুজ্জামান মানিক

আজি বিজয় উল্লাসে মাতি
রক্তের বাঁধন মনে আসি,
জাগালো মনে শোকের মাতন
আজি স্বজন হারা ব্যাথার ভারে
আক্রোশে মন প্রতিশোধের আঘাত হানি।

দেশ মাতৃতার বিনাশ তরে
দেখেছি যাদের নির্যাতনে লোলপ হাসি,
মা বোনেরা হিংস্র থাবায় সর্বনাশী।
পিতার রক্তে সবুজ ঘাসে
লাঙ্গল জোয়াল মাখামাখি।
আমি এখনও বেঁচে আছি
রুষে উঠি চেতনায় জাগি।
চির যৌবনের উম্মাদনা
দুরন্ত দুর্বার সম্মুখে চলি।
লাল সবুজের পতাকায়
মুজিব তোমার ছবি আঁকি।

সোনার মানুষ সোনার ফসল
তীরে ভিড়াই নৌকা খানি।
যাদের শ্রমে রক্ত ঘামে
তাদের দুঃখ কষ্ট গুলো
মুছে দিয়ে চিরতরে,
করবো সবে বিজয়েরই জয় ধ্বনি।

বোঝা

মোয়াজ্জেম বিন আউয়াল

বয়স আমার বেড়ে গেছে
হয়ে গেছি বৃদ্ধ।
ছেলে ও তার বউয়ের কাছে
বোঝা আমি নিত্য।
এই ছেলেরই ছোট বেলা
আবদার ছিল বেশ।
কাপড়, খাদ্য, খেলনাপাতি
চাহিবার নেই শেষ।
বয়স আমার বেড়ে গেছে
হয়ে গেছি বৃদ্ধ।
নানান রকম অজুহাতে
ঝগড়া চলে নিত্য।
সকাল গড়িয়ে দুপুরে যায়
ব্যস্ত ছেলের বউ,
দুমুঠো ভাত চাইতেই তার
ওঠে ঝগড়ার ঢেউ।
বয়স আমার বেড়ে গেছে
হয়ে গেছি বোঝা।

পান থেকে চুন খসলেই
বিচার দিবে সোজা।
তোমার বাবা এ করেছে,
সে করেছে..
আরো কত কি ?
জীবনটা আজ বোঝার
মাঝে বেঁধে ফেলেছি।

প্রকৃতি মা

ম আ ছাত্তার

প্রকৃতি মা বসে আছো
দিল দরজা খুলে;
আলো দিচ্ছ বায়ু দিচ্ছ
মন ভরে দাও ফুলে।

অন্ন দিচ্ছ বস্ত্র দিচ্ছ
দিচ্ছ প্রাণের জল;
সজীব রাখতে মোদের জীবন
দিচ্ছ কত ফল!

বৃক্ষ লতা গুল্ম দিচ্ছ
দিচ্ছ সবুজ কত;
পাখি বসে বাশি বাজায়
মধুর সুরে শত!
পাহাড় পর্বত নদী নালা
আছে আরো যত;
সবার বসে নীরব ধ্যানে
মোদের সেবায় রত।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
করে ঝলমল;
তোমার আভায় ডুবে সবায়
করি কোলাহল।

আল্লাহ ভগবান দেবতা যত
তোমার উপর নাই;
খুঁজতে গিয়ে সৃষ্টির মূলে
কেবল তোমায় পাই।

দীপ্ত হৃদ মতিন এর কবিতাবলী

আমাদের জাতীয় পতাকা

উৎসর্গঃ আমাদের সকল শহীদের পবিত্র আত্মার শান্তি কামনার্থে

জাতীয় পতাকা তুমিতো নও, সাধারন সেলাই করা
লাল-সবুজ রঙের শুধুমাত্র দু'টি টুকরো কাপড় !
তুমিতো পনেরো কোটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের মিছিলে,
এ দুনিয়া কাপানো, আকাশ ফাটানো একটি স্লোগান,
বহু ছবি, বহু পোস্টার, বহু ব্যানার, বহু গান,
বীর জনতার বহু সমাবেশে তেজোময় বক্তৃতা,
বহু কবির নিভৃত অন্তরের বলিষ্ঠ কবিতা,
অনেক আগুন, অনেক ধ্বংসস্তুপ, অনেক ত্যাগ,
অনেক কষ্ট, অনেক কান্না, অনেক অনেক লাশ,
এ মাটিতে জেগে থাকা শহীদের হাড়ের বোবা কান্না।
৫২, ৬৬, ৬৯, ৭১ এবং ২১, ৭, ২৫, ২৬, ১৬
এগুলো কি শুধুই পাটি গণিতের সাধারন সংখ্যা ?
লাখো লাখো শহীদের বীরত্বের জীবন্ত ইতিকথা,
প্রাণের মাতৃভাষা,অনেক স্বপ্নের স্বাধীনতা,
লাল প্লাবনের এক একটি প্রবল স্রোতের নাম ।
লাল প্লাবনের গভীর স্রোতে ভেসে আসা পতাকা,
আমাদের পতাকা, অতি কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে আসা
অতি আকাঙ্ক্ষিত, প্রাণময় দীপ্ত এক ছবি তুমি,
আমাদের অর্জণের, বীরত্বের, মর্যাদার প্রতীক,
তুমি লাল আর সবুজের, আমাদের জাতীয় পতাকা ।
প্রতিদিন তোমাকে আমাদের প্রাণের গান শুনাই,
আমরা নিভৃত ভালোবাসার বিনম্র সালাম জানাই।
আমাদের জাতির পিতা এবং জাতীয় পতাকা,
আজ বীর বাঙ্গালীর নিভৃত প্রাণে এক সুরে গাঁথা।

শূণ্যতা

উৎসর্গ:-বড় (হেলেন) আপা ও বড় দুলাভাই।

নীরবতা আর শূন্যতার মাঝে জেগে উঠে
আমার যতো আকাঙ্খার অলংকার,
হৃদয়ের নিভৃতে ধারণ করেছিলাম
যাদের, চোখের সীমানায় মমতার
আঁচলে জড়িয়ে রেখেছিলেম যাঁদের,
আজ সময় কাটে,তাঁদের শূন্যতায়।
নিভৃতে আঁকা শুধু তাঁদেরই ছবি,
নীরবতার মাঝে সহসাই জেগে উঠে,
অলংঙ্কারগুলি,অশ্রুতে ভিজিয়ে রাখি।
যেখানেই থাকো, দৃষ্টির সীমানায় আছো,
হৃদয়ের যতো শুভ কামনা, নিরন্তর
নিরাপদে থেকো আমার অলংকার।

কেউ রেহাই পায়না

মানুষ মানুষের কোনো ক্ষতি করে
কখনো লাভবান হয় কি নিজে!

তবুও অলীক এক কুনেশার ঘোরে
পড়ে সে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে।

এসব থাকে না বিধাতার অগোচরে,
সময় সাক্ষ্য দেয় সঠিক আদালতে,
অপকর্মের বিচার হয় অমোঘভাবে।

প্রকৃতির বিচার যখনি বুঝতে পারে
তখন কি সে রায় আর খণ্ডাতে পারে!

মোঃ আবদুল মতিন, লেখক নাম দীপ্ত হৃদ মতিন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়।
জন্মস্থান : আড়াইহাজার উপজেলার কালাপাহাড়িয়া গ্রাম।

মোশার্‌রফ মাতুব্বর এর কবিতাগুচ্ছ

মায়া

ভালোবাসা যখন প্রহসন হয়, মৃত্যু তখন হাত বাড়ায়;
নিদারুণ কষ্টে কেবলই বেঁচে থাকার সাধ হারায়,
বাহিরের আগুনকে জল ভেবে ডুবে যেতে মন চায়।
সবকিছু ভুলে গিয়ে উঠে দাঁড়াই,
যখন তোর মুখ ভেসে ওঠে আয়নায়।

শোকরিয়া

একদিন কেঁদেছিলাম খুব করে,
নদী ভাসিয়ে উলুঙ্গ করে দিয়েছিলো;
পাহাড় কান্নার জল আগলে দাঁড়িয়ে বলে
গেলো ধৈর্য্য ধরো,
মায়ের চোখের জলে সমুদ্র আছে,
একদিন এই নোনাজলে ভেসে যাবে রাবণের শহর।
আমি আজ বিমুগ্ধ নয়নে প্লাবন দেখেছি।

আমানত

দিনের শেষে কাকেদের ডানায় ফিরছে
অজস্র অশুভ শক্তি
চিলেকোঠা জুড়ে জড়ো হচ্ছে ঘুটঘুটে অন্ধকার,
দরজা খুললেই হুরমুর করে ঢুকে যাবে আততায়ী।
অথচ তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল সূর্য
তুমি ঝোলা থেকে বের করলেই কেটে
যেতো যত অন্ধকার।

জন্মের বারোপাতা

মৃত্যু নিবন্ধন করাই থাকে
তবুও জন্মদিন এসে এক পা এগিয়ে রাখে।
এই চলে যাওয়া নিয়ে আক্ষেপ নেই
আক্ষেপ থেকে যাবে এ জন্মের
মানুষ কিংবা শয়তান হতে না পারার।

ভাঁটফুল

অজস্র বছরের ক্লান্তি শেষে ঘরমুখো ধূসর ডানার চিল,
অবসন্ন বিকেলে শ্বেত পাথরের ছড়াছড়ি পথে ও প্রান্তরে
সমস্ত দিনের শেষে তোমার ফেরার পথে পায়ে পায়ে ঘাসফুল।
অথচ ভালোবাসা আজ ফেরার, অদ্ভুত অন্ধকার মুখোমুখি;
আমার সকালগুলো কেবলই সূর্যমুখী স্বপ্নের ভেতরে হেঁটে যায়।
জীবন স্বপ্নের শহর ছেড়ে ধূলোমাখা পথে ফোঁটে থাকা ভাঁটফুল।

তোমার জন্য এলিজি

সায়েম অনিন্দ্য

তুমি বলো, দ্রোহের কিছু বলো না
আমি চাঁদো অতিথী
অনঘ সন্তান ।

আমি বলি, প্রেমমান্ধ, তুমি
আলো করো দান !

তুমি বলো, নতমুখো হও।
শীর উঁচিয়ো না
আমি অনন্তবাক্ষান
তুমি প্রেমে চন্ডাল ।

আমি বলি, মনোহর মানি এই ব্যাবধান !
এই যদি হয় হৃদয়ের দান

ভালোবাসা রেখে গেলাম-
স্মৃতি হাতড়িয়ে ভেবে ভেবে যাব
একদিন স্বজন ছিলাম ।

তুমি বলো, অহেতুক মন বেঁধো না
আমি কস্তুরীমৃগ
লোবানের ঘ্রাণ।

আমি বলি, এ আমার
ঘোরলাগা আসমান ।

তুমি বলো, কাঁটাতার পেরিয়ো না
আমি স্বর্গীয়দেবতা
তুমি ঘোরান্ধমৃত্তিকা ।

আমি বলি,তুমি অনুপম প্রাণনাথ !
এই যদি হয় আমাদের ব্যাবধান
আঁখি জলে ভেসে গেলাম-
তবু অহর্নিশ ভেবে মরে যাব
তোমার এই অনিন্দ্য প্রতিদান ।

তুমি বলো,আহা ! মরি মরি
আশেকান !
একি বুনো প্রেমে পোড়াও
বুকের গভীর চাতাল ?
আমি বলি,তুমি ইশ্বর,আমি
মাটির কাঁকাল !

আড়াইহাজার এর গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বরসমূহ

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু *মাননীয় সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-২*	০১৭১২২৯০২৯০
মুজাহিদুর রহমান হেলো সরকার *চেয়ারম্যান, আড়াইহাজার উপজেলা পরিষদ*	০১৭১১০০৬৩০০
রফিকুল ইসলাম, *ভাইস চেয়ারম্যান*	০১৭১১৪৫৪৩৫১
ঝর্না রহমান, *ভাইস চেয়ারম্যান*	০১৭৪৫৩৬৩৯৫৯
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭৬৮০৪৭১৯৪
সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০১৭৬৪৭১৮১৫০
অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি), *আড়াইহাজার থানা*	০১৭১৩৩৭৩৩৪৯
ডিউটি অফিসার, *আড়াইহাজার থানা*	০১৯৪৮২৫৬৫৮৭
আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন	০১৭৩২৯৩৯৩৫২
সাংবাদিক সফুরউদ্দিন প্রভাত, *দৈনিক সমকাল*	০১৭১৩৫০৪৪৪১
রূপালী ব্যাংক লি. আড়াইহাজার শাখা	০১৭১০-৩৪৮৭২০
আলহাজ্ব সুন্দর আলী, *মেয়র, আড়াইহাজার পৌরসভা*	০১৭১৩০০৬৩৯১
আলহাজ্ব এম এ হালিম সিকদার, *মেয়র, আড়াইহাজার পৌরসভা*	০১৭১১৩৪০০৮২
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	
অদুদ মাহমুদ *(সাতগ্রাম)*	০১৭১৩৫১৭১০৭
সাহিদা মোশারফ *(দুপ্তারা)*	০১৭৩২১৮৬২৬৪
আলহাজ্ব লাক মিয়া *(ব্রাহ্মন্দী)*	০১৭১৩৫৬৫৪৫৪
আলহাজ্ব আবু তালেব মোল্লা *(ফতেপুর)*	০১৮১৪৯১৪৯৫৬
আলী হোসেন ভূঁইয়া *(হাইজাদী)*	০১৭৭৪৭৪৭৪০৩
সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া *(বিশনন্দী)*	০১৭৬৫৪৫৩২১০
নাজিমউদ্দিন মোল্লা *(উচিৎপুরা)*	০১৭১৩২২৫৭৮৮
আরিফুল ইসলাম *(খাগকান্দা)*	০১৮১৯৯৮৫৩৮৯
আমানউল্যাহ আমান *(মাহমুদপুর)*	০১৯৭১৩৪৫৮৪২
সাইফুল ইসলাম স্বপন *(কালাপাহাড়িয়া)*	০১৭১৩০৩০৫৮৬

সৌজন্যে

আবুল হোসেন
ব্যাংকার ও সমাজ সেবক
বদলপুর, কালাপাহাড়িয়া।
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ